بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ মোতাবেক ০১ তবলীগ ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত আবু হুযায়ফাহ্ বিন উতবাহ্ (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবু হুযায়ফাহ্। তার নাম হুশায়ম অথবা হাশেম বা কায়েস, হিসল, ইসল এবং মিকসামও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। উম্মে সাফওয়ান ছিলেন তার মা। তার (আসল) নাম ছিল ফাতেমা বিনতে সাফওয়ান। তিনি দীর্ঘকায় ও সুশ্রী চেহারার অধিকারী ছিলেন আর মহানবী (সা.)-এর দ্বারে আরকামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। **(আত্ তাআকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬১-৬২, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত), {মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৮, হাদীস নং: ৪৯৯৩, কিতাব মা'রেফাতুস্ সাহাবা (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে মুদ্রিত}, (ইমতা'য়াল্ আসমা', ১৪তম খণ্ড, পৃ: ৩৩৫, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৯ সালে মুদ্রিত)** তিনি প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়নকারীদের একজন ছিলেন। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন,

আবু হুযায়ফাহ্ বিন উতবাহ্ (রা.) বনী উমাইয়া গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল উতবাহ্ বিন রাবীয়াহ্, যিনি ছিলেন কুরাইশ নেতাদের একজন। আবু হুযায়ফাহ্ (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন, যা হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে মুসায়লামা কায্যাব এর বিরুদ্ধে হয়েছিল। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃ: ১২৪}**

হযরত আবু হুযায়ফাহ্ (রা.) ইথিওপিয়ার উভয় হিজরতে অংশ নিয়েছিলেন। তার (রা.) স্ত্রী হযরত সাহলাহ্ বিনতে সুহায়লও তার সাথে হিজরত করেছেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬২, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)**

অন্যান্য সাহাবীর স্মৃতিচারণে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কীভাবে এবং কেন ইথিওপিয়ায় হিজরত হয়েছিল। এখানেও আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং হাদীসের আলোকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) যা সংকলন করেছেন, তা আরো সংক্ষিপ্ত রূপে বা তার মধ্যে থেকে কয়েকটি কথা নিয়ে আমি বর্ণনা করব। তিনি (রা.) লিখেন,

মুসলমানদের কষ্ট যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, আর কুরাইশদের নির্যাতন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে ইথিওপিয়া অভিমুখে হিজরতের নির্দেশ দেন এবং বলেন, ইথিওপিয়ার বাদশাহ্ ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক, তার রাজত্বে কারো প্রতি অবিচার করা হয় না। সে যুগে ইথিওপিয়া একটি শক্তিশালী খ্রিষ্টান রাজত্ব ছিল। সেখানকার বাদশাহ্র উপাধী ছিল নাজ্জাশী। ইথিওপিয়ার সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। মুসলমানরা যখন হিজরত করে, তখনকার নাজ্জাশী বাদশাহ্র নিজের নাম ছিল আসহামাহ্, যিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, জাগ্রত-বিবেক এবং শক্তিশালী বাদশাহ্ ছিলেন। যাহোক, মুসলমানদের কষ্ট যখন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন,

যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন ইথিওপিয়া অভিমুখে হিজরত করে। অতএব, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে পঞ্চম নববীর রজব মাসে ১১জন পুরুষ এবং ৪ জন মহিলা ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। তাদের মাঝে সুপরিচিত নামগুলো হল, হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) এবং তার সহধর্মিণী ও মহানবী (সা.)-এর দুহিতা হযরত রুকাইয়্যা (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.), হযরত আবু হুযায়ফাহ্ বিন উতবাহ্ (রা.), (এখন যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে- ইনিও প্রথম হিজরতকারীদের দলে ছিলেন,) হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.), হযরত মুসআ'ব বিন উমায়ের (রা.), হযরত আবু সালমাহ্ বিন আব্দুল আসাদ (রা.) এবং তার স্ত্রী হযরত উম্মে সালামাহ্ (রা.)।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, আশ্চর্যের বিষয় হল, প্রাথমিক হিজরতকারীদের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি তাদের ছিল যারা কুরাইশের শক্তিশালী গোত্রগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখতেন, আর দুর্বল লোকদের কমই দেখা যায়। যা থেকে দু'টো কথা বোঝা যায়। প্রথমত, শক্তিশালী গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত লোকেরাও কুরাইশদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ ছিল না। আর দ্বিতীয়ত দুর্বল অর্থাৎ ক্রীতদাস ও অন্যান্যরা তখন এতই দুর্বল ও অসহায় ছিল যে, তারা হিজরতের সামর্থ্যও রাখতো না। এই মুহাজিররা দক্ষিণ দিকে সফর করে যখন সুআ'য়বা পৌঁছে, যা সে যুগে আরবের একটি সামুদ্রিক বন্দর ছিল, তখন খোদার এমন কৃপা হয় যে, তারা একটি বাণিজ্যিক জাহাজ পেয়ে যায়, যা ইথিওপিয়া অভিমুখে যাত্রার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। তাই তারা সেই জাহাজে আরোহণ করেন। ইথিওপিয়া পৌঁছে মুসলমানরা খুবই শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনে ধন্য হয় আর আল্লাহ্‌র কৃপায় কুরাইশদের নির্যাতন থেকে নিস্তার লাভ করে। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই মুহাজিরদের ইথিওপিয়া যাওয়ার স্বল্পকাল পরেই তাদের কাছে এই উড়োখবর পৌঁছে যে, সব কুরাইশ মুসলমান হয়ে গেছে, আর মক্কা এখন শান্তিধামে রূপ নিয়েছে। এই খবরের ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হল- বেশিরভাগ মুহাজির অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করেই ফিরে আসে।

এই গুজবের কারণ কী ছিল আর তা কীভাবে ও কেন ছড়িয়ে পড়লো এ সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ গবেষণা করে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) কিছুটা আলোকপাত করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, যদিও বাস্তবে এই গুজব সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ছিল, যা ইথিওপিয়ার মুহাজিরদের ফিরিয়ে আনার এবং কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে কুরাইশরা-ই ছড়িয়ে থাকবে। বরং গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই গুজব এবং মুহাজিরদের ফিরে আসার বৃত্তান্ত ভিত্তিহীন বলে মনে হয়, কিন্তু (তিনি লিখেছেন) এটিকে সঠিক ধরে নেয়া হলেও হয়ত এর অন্তরালে সেই ঘটনা অন্তর্নিহিত থাকবে যা কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে বুখারীতেও এ ঘটনাটি রয়েছে যে, একবার মহানবী (সা.) কাবা-চত্বরে সূরা নজমের আয়াত পাঠ করেন। তখন সেখানে কাফিরদের বেশ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিল, (আর) কতক মুসলমানও ছিল। তিনি (সা.) সূরা নজম পড়া শেষ করার পর সিজদা করেন। (উপস্থিত) সব মুসলমান এবং কাফিরও তাঁর (সা.) সাথে সেজদাবনত হয়। কাফিরদের সেজদা করার কারণ হাদীসে বর্ণিত হয় নি। কিন্তু মনে হয়, মহানবী (সা.) যখন খুবই প্রভাব বিস্তারী কণ্ঠে ঐশী বাণী পাঠ করেন, আর সেই আয়াতগুলোও এমন ছিল যাতে বিশেষভাবে খোদার একত্ববাদ, তাঁর শক্তিমত্তা এবং প্রতাপের অত্যন্ত বাগ্মিতাপূর্ণ চিত্রাঙ্কণ করা হয়েছে। অধিকন্তু তাঁর অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করানো হয়েছে, আর অত্যন্ত প্রভাবান্বিত ও প্রতাপান্বিত বাণীতে কুরাইশকে সতর্ক করা হয়েছিল, তারা যদি নিজেদের

দুষ্কৃতি থেকে বিরত না হয় তাহলে তাদের পরিণতি তা-ই হবে যা তাদের পূর্ববর্তীদের হয়েছিল, যারা আল্লাহ্ তা'লার রসূলকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। শেষের দিকে এই আয়াতগুলোতেই এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, আস, আল্লাহ্‌র সমীপে সিজদাবনত হও। আর এ আয়াতগুলো তিলাওয়াতের পর মহানবী (সা.) এবং সব মুসলমান তৎক্ষণাৎ সিজদাবনত হয়। অতএব, কুরাইশদের ওপর এই বাণী এবং এই দৃশ্যের এমন জাদুকরী প্রভাব পড়ে অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের ওপরও এমন গভীর প্রভাব পড়ে যে, তারাও মুসলমানদের সাথে অবলীলায় সিজদাবনত হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, এটি কোন আশ্চর্যজনক বিষয় নয়, কেননা এমন সময়ে বর্ণিত পরিস্থিতির অধীনে অনেক সময় মানব হৃদয় ভীত-ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আর সে অবলীলায় এমনটি করে বসে যা সত্যিকার অর্থে তার নীতি এবং বিশ্বাস পরিপন্থি হয়ে থাকে। যেমনটি আমরা দেখেছি, অনেক সময় কঠিন এবং আকস্মিক বিপদের সময় এক নাস্তিকও আল্লাহ্ আল্লাহ্ বা রাম রাম জপতে থাকে। আর কুরাইশরা তো নাস্তিক ছিল না, বরং তারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখতো। যদিও তারা মূর্তি-প্রতিমাকে আল্লাহ্‌র শরীক আখ্যা দিত। অধুনাকালেও অনেক নাস্তিকের সাথে আলোচনা কালে যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, কোন সমস্যায় নিপতিত হলে তোমরা কি আল্লাহ্‌র নাম মন থেকে জপো নাকি শুধুমাত্র বুলিসর্বস্ব উচ্চারণ কর? তখন তারা স্বীকার করে, মন থেকেই তাঁকে ডাকি। যাহোক, এটি সেই সূরা পড়ার বা সূরার বাক্যাবলীর এবং মুসলমানদের আচরণের একটি প্রভাব ছিল যার দরুন কাফিরদের নেতারাও একইসাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।

যাহোক, মুসলমানরা তাৎক্ষণিকভাবে সিজদায় লুটিয়ে পড়ায় এমন জাদুকরী প্রভাব পড়ে যে, কুরাইশরাও তাদের সাথে অবলীলায় সিজদাবনত হয়। কিন্তু এমন প্রভাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাময়িক হয়ে থাকে আর মানুষ খুব দ্রুতই নিজেদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। অতএব, কাফিররাও একইভাবে পূর্বের অবস্থার ফিরে যায়, অর্থাৎ তাদের অবস্থাও এমনই হয়ে যায়। যাহোক, এটি একটি ঘটনা যা সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত আর বুখারীতেও এটি লিপিবদ্ধ আছে। অতএব, ইথিওপিয়ার মুহাজিরদের ফিরে আসার সংবাদ সঠিক হয়ে থাকলে এমন মনে হয় যে, এই ঘটনার পর কুরাইশরা, ইথিওপিয়ার মুহাজিরদের ফেরত আনার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল যে, তারা হিজরত করে কেন চলে গেল, আমাদের হাত ফসকে বেরিয়ে গেল। (তাই) নিজেদের এই কাজকে পুঁজি করে হয়ত নিজেরাই এই গুজব ছড়িয়ে থাকবে যে, মক্কার কুরাইশরা মুসলমান হয়ে গেছে আর মুসলমানদের জন্য মক্কা এখন সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। ইথিওপিয়ার মুহাজিরদের কাছে এই গুজব যখন পৌঁছে, স্বভাবতই তারা এটি শুনে খুবই আনন্দিত হয় আর শোনামাত্রই আনন্দের আতিশয্যে চিন্তাভাবনা না করেই ফিরে আসে। কিন্তু তারা যখন মক্কার কাছে পৌঁছায় তখন প্রকৃত সত্য জানতে পায় আর বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হয়। তখন তাদের কতক গোপনে আর কতক কিছু শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী কুরাইশ নেতার আশ্রয়ে মক্কায় এসে যায়। আবার অনেকে ফিরে যায়। অতএব, কুরাইশদের মুসলমান হওয়া সংক্রান্ত গুজবের যদি কোন সত্যতা থেকে থাকে তাহলে তা কেবল ততটাই ছিল যতটা সূরা নজম তিলাওয়াতের পর সিজদা সংক্রান্ত ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। যাহোক, আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

যাহোক, ইথিওপিয়ার মুহাজিররা ফিরে আসলেও তাদের অধিকাংশই আবার ফিরে যান, কেননা কুরাইশরা প্রতিনিয়ত নিপীড়নে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। আর তাদের নির্যাতনও

প্রত্যহ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাই মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে অন্যান্য মুসলমানরাও সংগোপনে হিজরতের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। আর সুযোগ বুঝে তারা ধীরে ধীরে (মক্কা থেকে) বেরিয়ে যেতে থাকে। হিজরতের এই ধারা এমনভাবে চলতে থাকে যে, অবশেষে ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের সংখ্যা ১০১ জনে উপনীত হয়, যাদের মাঝে ১৮জন মহিলাও ছিল। আর মক্কায় মহানবী (সা.)-এর সাথে খুবই স্বল্পসংখ্যক মুসলমান রয়ে যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক এই হিজরতকে ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরত আখ্যায়িত করে থাকে। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ১৪৬-১৪৯}**

প্রথমে একটি হিজরত হয়েছিল এরপর পরবর্তীতে অন্যান্যরাও গিয়েছে। একইভাবে পরবর্তীতে যখন মদীনায় হিজরতের অনুমতি লাভ হয়, তখন আবু হুযায়ফাহ্ (রা.) এবং তার মুক্ত ক্রীতদাস হযরত সালেম (রা.) উভয়েই হিজরত করে মদীনায় গমন করেন। প্রথমে তারা ইথিওপিয়ায় হিজরত করেছিলেন আর সে যুগে ফিরেও আসেন এবং এরপর তারা দ্বিতীয়বার মদীনায় হিজরত করেন, যেখানে তারা উভয়েই আব্বাদ বিন বিশর (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু হুযায়ফাহ্ এবং আব্বাদ বিন বিশর (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬২, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)**

হযরত আবু হুযায়ফাহ্ (রা.) আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ-এর সারিয়াহ্ বা যুদ্ধাভিযানেও যোগদান করেছিলেন। **(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৮৬, বাবু সারিয়াহ্ আব্দিল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা.), বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সালে মুদ্রিত)** আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ-এর সারিয়াহ্ বা যুদ্ধাভিযানের পটভূমি এবং কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ যা সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে রয়েছে, তা উপস্থাপন করছি। মক্কার এক নেতা কুরয বিন জাবের ফেহরী কুরাইশদের একটি সৈন্যদলের সাথে চরম ধূর্ততার সাথে মদীনা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী একটি চারণভূমিতে অকস্মাৎ আক্রমণ করে আর মুসলমানদের উট বা গবাদিপশু ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এর সংবাদ পেতেই মহানবী (সা.) যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে তাঁর (সা.) অবর্তমানে আমীর নিযুক্ত করে মুহাজিরদের একটি দলকে সাথে নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করেন আর বদরের নিকটবর্তী একটি জায়গা সাফওয়ান পর্যন্ত তার পিছু ধাওয়া করেন। কিন্তু সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধকে 'গাযওয়ায়ে বদর আল্ উলা' (অর্থাৎ বদরের প্রথম যুদ্ধ)ও বলা হয়। তিনি আরো লিখেন, কুরয বিন জাবের এর এই আক্রমণ কোন সাধারণ মরুবাসীর বিচ্ছিন্ন আক্রমন ছিল না। অর্থাৎ, এমন নয় যে, কোন বেদুঈন এসে আক্রমন করেছে এবং অজ্ঞতাবশত শুধু চুরি-ডাকাতির মানসে আক্রমণ করেছে, বরং নিশ্চিতরূপে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষ থেকে বিশেষ দুরভিসন্ধি নিয়ে এসেছিল। বরং এটি একেবারেই অসম্ভব নয় যে, বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার ওপর আক্রমণই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু মুসলমানদেরকে চৌকস দেখে তাদের উট নিয়ে পালিয়ে যায়। এর মাধ্যমে এটিও বুঝা যায় যে, মক্কার কুরাইশরা মদীনায় গুপ্ত হামলার মাধ্যমে মুসলমানদের ধ্বংস করার বিষয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল।

কুরয বিন জাবেরের অতর্কিত আক্রমণ স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের খুবই ভীতবিহ্বল এবং হতভম্ব করে ফেলে। আর কুরাইশ নেতাদের হুমকি-ধমকি যেহেতু পূর্বেই ছিল যে, আমরা মদীনায় আক্রমণ করব আর মুসলমানদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করব, তাই মুসলমানরা খুবই উৎকণ্ঠিত হয়। আর এসব আশঙ্কা দেখে মহানবী (সা.) কুরাইশদের গতিবিধি খুব কাছে থেকে দেখা বা অবগত হওয়ার বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ হন। দেখা যাক, তাদের

পরিকল্পনা কী আর দুরভিসন্ধি কী। আর তা উদঘাটনের জন্য এমন পরিকল্পনা হাতে নেয়া উচিত যেন খুব কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে খবরাখবর আসতে থাকে, যাতে সময়মত অবগত হওয়া যায়। আর মদীনার ওপর আক্রমনের যে শংকা রয়েছে তা থেকে একে নিরাপদ রাখা যায়। অতএব, এ লক্ষ্যে তিনি (সা.) ৮জন মুহাজিরের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করেন। আর কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই সেনাদলে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতো। যেন কুরাইশের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয়। তিনি (সা.) নিজের ফুপাতো ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা.)-কে এই সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করেন। এই সেনাদলে আবু হুযায়ফাহ্ বিন উতবাহ্ (রা.)ও ছিলেন। সাধারণ মুসলমানরা যাতে এই সেনাদলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জানতে না পারে এ কারণে তিনি (সা.) এই সেনাদল প্রেরণের পূর্বে সেনাদলের সদস্যদের বলেন নি যে, কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রেরণ করা হচ্ছে। বরং যাত্রার প্রাক্কালে তিনি তাদের হাতে একটি সিলগালা বন্ধ খাম ধরিয়ে দেন। আর বলেন, এই চিঠিতে তোমাদের জন্য দিক-নির্দেশনা রয়েছে। সেইসাথে আরো বলেন, তোমরা যখন মদীনা থেকে অমুক দিকে দু'দিনের দূরত্ব অতিক্রম করবে তখন এই পত্র খুলে পত্রে এতে বর্ণিত দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী পদক্ষেপ নিবে। অতএব, আব্দুল্লাহ্ (রা.) এবং তার সাথিরা তাদের মনীবের নির্দেশে যাত্রা করেন। দু'দিনের পথ পাড়ি দেওয়ার পর আব্দুল্লাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনামা খুলে দেখেন। তাতে এই কথা লিপিবদ্ধ ছিল, তোমরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলাহ্ উপত্যকায় যাও। সেখানে গিয়ে কুরাইশদের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হও আর আমাদেরকে অবহিত কর। যেহেতু মক্কার এতটা কাছে গিয়ে খবর সংগ্রহ করা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ব্যাপার ছিল তাই তিনি (সা.) পত্রের শেষ দিকে এই দিক-নির্দেশনাও লিখে দিয়েছিলেন, এই মিশন সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তোমার কোন সাথি যদি এই সেনাদলের অংশ হতে দ্বিধান্বিত হয় এবং সে যদি ফিরে আসতে চায় তাহলে তার ফিরে আসার অনুমতি রয়েছে। আব্দুল্লাহ্ (রা.) তার সাথিদেরকে মহানবী (সা.)-এর দিক-নির্দেশনা শোনান এবং সবাই সমস্বরে ও সানন্দে এই সেবার জন্য আত্মনিবেদন করে বলেন, আমরা প্রস্তুত।

অতঃপর এই সেনাদল নাখলাহ্ অভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং উতবাহ্ বিন গাযওয়ান (রা.)'র উট হারিয়ে যায়, আর তারা এর সন্ধান করতে করতে নিজ সাথিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে, এমনকি অনেক সন্ধান করেও তাদেরকে পাওয়া যায় নি। এখন এটি কেবল ছয় সদস্যের একটি সেনাদল হয়ে যায়। এই ছয়জন নিজেদের মিশন বা লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে থাকে। মুসলমানদের এই ছোট্ট দলটি নাখলাহ্ পৌঁছে আর নিজেদের দায়িত্বে রত হয়, অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের অভিপ্রায় কী, মদীনায় আক্রমণ করার কোন দুরভিসন্ধি আছে কিনা, বা এখন তারা কি ষড়যন্ত্র করছে? তা জানার কাজে রত হয়। তাদের কেউ কেউ গোপনীয়তা রক্ষার মানসে মাথার চুল কামিয়ে ফেলে, যেন পথিকরা তাদেরকে উমরাহ্'র উদ্দেশ্যে আগত লোক মনে করে কোন সন্দেহ না করে। অর্থাৎ তারা যেন মনে করে, এরা উমরাহ্-র জন্য যাচ্ছে। (এটিই মনে করে যে, সম্ভবত এরাও উমরাহ্ করতে যাচ্ছে। তাই তারা নিজেদের মাথা ন্যাড়া করে ফেলেছিলেন।)

কিন্তু বলা হয়, তাদের সেখানে পৌঁছার পর খুব একটা সময় কাটে নি, হঠাৎ সেখানে কুরাইশদেরও একটি ছোট্ট কাফেলা এসে যায়, যারা তায়েফ থকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল আর উভয় দল মুখোমুখি হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন তারা জানতে পারে, এরা মুসলমান তখন

এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। মুসলমানরা নিজেদের কর্মপন্থা সম্পর্কে পরস্পর পরামর্শ করে, কেননা মহানবী (সা.) তাদেরকে গোপনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু (বাস্তব চিত্র হল,) ইতোমধ্যে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছে আর এখন দু'দল পরস্পর মুখোমুখি অবস্থানে ছিল। এছাড়া স্বভাবতই এই আশঙ্কাও ছিল, কুরাইশদের এই কাফেলা যেহেতু মুসলমানদের চিনে ফেলেছে তাই এই খবর সংগ্রহের বিষয়টিও গোপন থাকবে না। এছাড়া আরেকটি সমস্যাও ছিল, কিছু মুসলমানের ধারণা ছিল, এটি রজব মাসের দিন অর্থাৎ পবিত্র মাসগুলোর সমাপ্তি। (পবিত্র মাসগুলোর শেষ দিন) যাতে আরবের প্রাচীন রীতি অনুসারে যুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল না। কেউ কেউ মনে করত, রজব মাস ইতোমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে আর শাবান আরম্ভ হয়ে গেছে। আর কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, এই অভিযান প্রেরণ করা হয়েছিল জমাদীউল্ আখের-এ। আর এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল যে, এ দিনটি কি রজবের নাকি জমাদীউল্ আখের-এর। পক্ষান্তরে নাখলাহ্ উপত্যকাও একেবারে হারাম শরীফের সীমান্তে অবস্থিত ছিল। আর এটি জানা কথা, আজই যদি কোন সিদ্ধান্ত না হয় তাহলে কাল এই কাফেলা হারামে (হত্যা নিষিদ্ধ এমন অঞ্চলে) প্রবেশ করবে। যার সম্মান অক্ষুণ্ন রাখা অপরিহার্য।

মোটকথা, এসব কথা চিন্তা করে সেই ছয়জন মুসলমান এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন, কাফেলার ওপর আক্রমণ করে হয় তাদেরকে বন্দি করা উচিত নতুবা হত্যা করা উচিত। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আক্রমণ করে। যার ফলে আমের বিন আল্ হাযরামী নামক কাফিরদের একজন মারা যায় আর দু'জন ধরা পড়ে। কিন্তু চতুর্থ ব্যক্তি পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। মুসলমানরা তাকে বন্দি করতে পারে নি। আর এভাবে তাদেরকে হত্যা করা বা বন্দি করার এই পরিকল্পনা সফল হয়েও হলো না। এরপর মুসলমানরা কাফেলার সাজসরঞ্জাম হস্তগত করে। কুরাইশদের একজন যেহেতু প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল তাই এটি নিশ্চিত ছিল, এই সংঘর্ষের সংবাদ অচিরেই মক্কায় পৌঁছে যাবে, তাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ (রা.) এবং তার সাথিরা গণিমতের মাল নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

প্রাচ্য বিশাদরাও এ সম্পর্কে আপত্তি করে যে, দেখ! পরিকল্পিতভাবে এই সেনাদল পাঠানো হয়েছে আর জেনেশুনে কাফেলার ওপর আক্রমণ করানো হয়েছে– এটি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত কথা। যাহোক, সত্য কথা হল, মহানবী (সা.) যখন জানতে পারেন, সাহাবীরা কাফেলার ওপর আক্রমণ করেছে, তিনি (সা.) খুবই অসন্তুষ্ট হন। অতএব, বর্ণনায় এসেছে, যখন এই দলটি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয় আর তিনি (সা.) পুরো বৃত্তান্ত অবগত হন তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমি তোমাদেরকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার অনুমতি দেই নি। এমনকি তিনি (সা.) গণিমতের মাল নিতেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, এথেকে আমি কিছুই নিব না। এতে আব্দুল্লাহ্ (রা.) এবং তার সাথিরা যারপরনাই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন। তারা ধরে নেন, আমরা খোদা এবং তাঁর রসূলের অসন্তুষ্টির দরুন এখন ধ্বংস হয়ে গেছি। তাদের মাঝে চরম ভীতি সঞ্চারিত হয়। মদীনায় অবস্থিত সাহাবীরাও তাদেরকে কঠোর ভর্ৎসনা করেন যে, তোমরা এমন কাজ করেছ যার নির্দেশ তোমাদের দেয়া হয়নি। তোমরা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করেছ, অথচ এই অভিযানে তোমাদেরকে আদৌ যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি।

অপরদিকে কুরাইশরাও হৈ-চৈ আরম্ভ করে যে, মুসলমানরা পবিত্র মাসের পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছে। আর যে ব্যক্তি মারা গিয়েছিল অর্থাৎ আমর বিন হাযরামী, সে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিল। এছাড়া সে মক্কার নেতা উতবাহ্ বিন রবিআ'হ্'র মিত্রও ছিল। এ কারণেও সে সময় এই ঘটনাটি মক্কার কুরাইশদের ক্রোধাগ্নিতে আরো ঘৃত ঢালার কারণ হয়। তারা নবোদ্যমে মদীনার ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি আরম্ভ করে। যাহোক, এই ঘটনায় মুসলমান এবং অবিশ্বাসীদের মাঝে অনেক বাদানুবাদ হয়। আলোচনা হতে থাকে যে, মুসলমানরা পবিত্র মাসে আক্রমন করেছে। সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, অবশেষে নিম্নলিখিত কুরআনী আয়াত অবতীর্ণ হলে মুসলমানদের স্বস্তির কারণ হয়।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا (সূরা বাকারা: ২১৮)

অর্থাৎ, মানুষ তোমাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি তাদের উত্তর দাও, নিঃসন্দেহে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা অত্যন্ত অপছন্দনীয় বিষয়, কিন্তু পবিত্র মাসে মানুষকে আল্লাহ্‌র ধর্ম থেকে বলপ্রয়োগে বিরত রাখা বরং পবিত্র মাস এবং মসজিদে হারাম উভয়টির অবমাননা অর্থাৎ এগুলোর সম্মানকে পদদলিত করা, আর এরপর হারাম থেকে এর অধিবাসীদের বাহুবলে বহিষ্কার করা, যেমনটি কিনা হে মুশরিকরা! মুসলমানদের বহিষ্কার করে তোমরা করছ– খোদার দৃষ্টিতে এসব বিষয় পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা থেকেও অনেক বেশি অপছন্দনীয়। নিশ্চয় পবিত্র মাসে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা সেই হত্যা থেকে ঘৃণ্য যা নৈরাজ্যকে প্রতিহত করার জন্য করা হয়। হে মুসলমানেরা! কাফিরদের অবস্থা হল, তোমাদের শত্রুতায় তারা এতটাই অন্ধ যে, যেকোন স্থানে যেকোন সময় তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হবে না। আর তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত না করা পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে, যদি তাদের জন্য সম্ভব হয়।

কাজেই, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশ নেতারা পবিত্র মাসেও সমানতালে নিজেদের হিংস্র অপপ্রচার চালিয়ে যেতো। বরং এ পবিত্র মাসগুলোর ইজতেমা বা সম্মেলন এবং সফরকে কাজে লাগিয়ে তারা এসব মাসে নৈরাজ্যপূর্ণ কার্যকলাপে আরো ধৃষ্ট হয়ে উঠতো। এছাড়া চরম নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়ে, মিথ্যা আত্মপ্রসাদ লাভের বাসনায় সম্মানিত মাসগুলোকে আগেপিছে স্থানান্তরিত করতো, যাকে তারা 'নাসী' আখ্যায়িত করতো। মুসলমানদের সাথে তারা মক্কা বিজয় পর্যন্ত এই ব্যবহারই অব্যাহত রাখে, বরং (এ ক্ষেত্রে) সীমাতিক্রম করে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই শব্দ ব্যবহার করেছেন যে, তারা তো চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিল, অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির যুগে পাকা কথা ও চুক্তি থাকা সত্ত্বেও মক্কার কাফির এবং তাদের সাথিরা হারাম-এর অভ্যন্তরে মুসলমানদের এক মিত্র গোত্রের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে আর মুসলমানরা যখন সেই গোত্রের সমর্থনে এগিয়ে আসে তখন তাদের বিরুদ্ধেও একেবারে হারামের ভেতরে তরবারি চালায়। অতএব এই উত্তরে, যা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন, (এতে) মুসলমানদের তো স্বস্তি পাওয়ারই কথা, বরং কুরাইশরাও কিছুটা বিরত হয়।

আর এরই মাঝে তাদের লোকেরাও নিজেদের দু'জন বন্দিকে মুক্ত করানোর লক্ষ্যে মদীনায় পৌঁছে যায়। অভিযানে বের হওয়া মুসলমানরা যে দু'জন বন্দি ধরে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত যেহেতু সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং উতবাহ্ (রা.) ফিরে আসেন নি। অর্থাৎ যাদের উট হারিয়ে গিয়েছিল, তারা ফিরে আসেন নি। তাদের সাথে সাক্ষাতও হয় নি, তাই তাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর গভীর শঙ্কা ছিল, তারা যদি কুরাইশদের হাতে ধৃত হয় তাহলে কুরাইশরা তাদের হত্যা করবে। এ কারণে মহানবী (সা.) তাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত বন্দিদেরকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান। কাফিররা যখন বন্দিদের নিতে আসে তখন তিনি (সা.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এই দু'জন ফিরে না আসে ততক্ষণ তোমাদের বন্দিদের ছাড়ব না। তাই তিনি (সা.) তাদের কথা মানতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমার লোকেরা নিরাপদে মদীনায় পৌঁছলে আমি তোমাদের লোকদের ছেড়ে দিব। অতএব, তারা দু'জন ফিরে এলে তিনি (সা.) ফিদিয়া বা মুক্তিপণ নিয়ে উভয় বন্দিকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু মদীনায় অবস্থানকালে এই উভয় বন্দির মধ্যে একজনের ওপর মহানবী (সা.)-এর উত্তম নৈতিক চরিত্র এবং ইসলামী শিক্ষার সত্যতার এমন গভীর প্রভাব পড়েছিল যে, মুক্তি লাভের পরও সে ফিরে যেতে অস্বীকার করে আর মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করে এবং তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় আর অবশেষে বি'রে মঊনায় শহীদ হন। তার নাম ছিল হাকাম বিন কীসান। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ. (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৩৩০-৩৩৪}** যদি অত্যাচার এবং বলপ্রয়োগ করে মুসলমান বানানো হতো তাহলে (মানুষ) এভাবে ইসলাম গ্রহণ করতো না।

হযরত আবু হুযায়ফাহ্ (রা.) সম্পর্কে এটিও বলা হয়, বদরের যুদ্ধের দিন তিনি (রা.) তার পিতার সাথে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হন, কেননা তার পিতা মুসলমান ছিল না; কাফিরদের সাথে এসেছিল। তখন মহানবী (সা.) তাকে বাধা দেন এবং বলেন, তাকে ছেড়ে দাও; অন্য কেউ তাকে হত্যা করবে। অর্থাৎ, অন্য কাউকে তার সাথে লড়াই করতে দাও। এরপর তার (রা.) পিতা, চাচা, ভাই এবং ভাতিজাকে হত্যা করা হয়। তারা সবাই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়। হযরত হুযায়ফাহ্ (রা.) পরম ধৈর্য প্রদর্শন করেন আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থেকে তাঁর সেই সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন যা তিনি মহানবী (সা.)-এর সমর্থনে প্রদর্শন করেছিলেন, অর্থাৎ বিজয় দান করেছিলেন। **(আব্দুল জব্বার প্রণীত তাসবিয়্যাতু দালায়েলুন নবুয়্যা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮৫, বৈরুতের দারুল আরাবিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

এই ঘটনা সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত পাওয়া যায় আর তা হল, ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের মাঝ থেকে আব্বাসের সাথে যার যুদ্ধ হবে সে যেন তাকে হত্যা না করে, কেননা তিনি অপারগতায় এসেছেন। তাই তাকে বন্দি করো, হত্যা করো না। যখন হযরত আবু হুযায়ফাহ্ (রা.)'র কাছে এই কথা পৌঁছে বা কেউ তাকে অবহিত করে তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর সামনে নয় বরং অন্য কোথাও কোন সঙ্গীকে বলেন, আমরা কি নিজেদের পিতা, ভাই এবং আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করব আর আব্বাসকে ছেড়ে দিব! এটি কেমন কথা? খোদার কসম! সে যদি আমার সামনে পরে তাহলে আমি অবশ্যই তার ওপর তরবারি চালাব। মহানবী (সা.)-এর কানে যখন একথা পৌঁছে তখন তিনি হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, **ইয়া আবা হাফ্‌স!** অর্থাৎ হে হাফ্‌সার পিতা, খোদার রসূলের চাচার চেহারায় তরবারি দ্বারা আঘাত করা হবে! হযরত উমর (রা.) বলেন, এই প্রথম মহানবী (সা.) আমাকে আবু হাফ্‌স ডাকনাম প্রদান করেন।

হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে অনুমতি দিলে তরবারি দ্বারা আমি তার শিরোচ্ছেদ করবো। খোদার কসম! যে এই কথা বলেছে তার মাঝে কপটতা রয়েছে। হযরত আবু হুযায়ফাহ্ (রা.) বলতেন, মহানবী (সা.) নিষেধ করে বলেন, এমনটি করো না। কিন্তু হযরত আবু হুযায়ফাহ্ (রা.) বলতেন, সেদিন আমি যে কথা বলেছি, (তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আমি অনেক বড় বাজে কথা বলে ফেলেছি) তার ক্ষতি থেকে আমি নিরাপদ নই। আমি এমন কথা বলে বসেছি, যে কারণে আমি শান্তিতে থাকতে পারবো না। একারণে আমি সর্বদা ত্রস্ত থাকব, তবে শাহাদতের মৃত্যু আমাকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলে তা ভিন্ন কথা। অর্থাৎ আমি যদি ইসলামের জন্য শহীদ হই তবেই যে কথা আমি বলেছি তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ বোধ করবো। বর্ণনাকারী বলেন, অতএব তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেন। **(মুসতাদরেক আলাস্ সহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৭-২৪৮, হাদীস নংঃ ৪৯৮৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে মুদ্রিত)** আবেগের আতিশয্যে একটি কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় কিন্তু এরপর ভীতিও জাগে আর শহীদ না হওয়া পর্যন্ত আজীবন তার সেই ভীতি ছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) নিহত মুশরীকদের একটি গর্তে বা কূপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। কাজেই তাদের সেখানে নিক্ষেপ করা হলে মহানবী (সা.) তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, হে কূপবাসীরা! তোমরা কি তোমাদের সেই প্রতিশ্রুতিকে সত্য পেয়েছ যা তোমাদের প্রভু অর্থাৎ প্রতিমারা তোমাদের সাথে করেছিল?। আমি নিশ্চিতরূপে সেই প্রতিশ্রুতিকে সত্য পেয়েছি যা আমার প্রভু আমার সাথে করেছিলেন। আর এখানে 'রব' বলতে যদি আল্লাহ্ তা'লাকে বুঝানো হয় তাহলে এর অর্থ হল, তোমরা শাস্তি পাবে। যাহোক, মহানবী (সা.) বলেন, আমি সেই প্রতিশ্রুতিকে সত্য পেয়েছি যা আল্লাহ্ তা'লা আমার সাথে করেছিলেন। অর্থাৎ, আমি তাদেরকে শাস্তি দিব আর তারা তোমার ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। তখন মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি তাদের সম্বোধন করছেন যারা মৃত? তিনি (সা.) বলেন, নিশ্চয় এরা জেনে গেছে, তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সত্য ছিল।

মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তাদেরকে যখন কূপে নিক্ষেপ করা হয় তখন হযরত আবু হুযায়ফাহ্ (রা.)'র চেহারায় অসন্তোষের ছাপ দেখা যায় কেননা তার পিতাকেও কূপে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। তিনি (সা.) তাকে বলেন, হে আবু হুযায়ফাহ্! খোদার কসম! মনে হচ্ছে, তোমার পিতার সাথে যে ব্যবহার হচ্ছে তা তোমার পছন্দ হচ্ছে না। মহানবী (সা.) হযরত আবু হুযায়ফাহ্‌কে এই প্রশ্ন করলে তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার পিতা ছিলেন ধৈর্যশীল, সত্যবাদী এবং সুপারর্শক। তিনি নিজের মতে যা বুঝতেন সেটিকেই সঠিক মনে করতেন। কিন্তু তার মাঝে কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। আর আমি চাইতাম, আল্লাহ্ তা'লা যেন তার মৃত্যুর পূর্বেই তাকে ইসলামের পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু যখন আমি দেখলাম, এমনটি হওয়া এখন আর সম্ভব নয় আর তার সেই পরিণতি হয়েছে যা হওয়ার ছিল, তাই এ বিষয়টি আমাকে ব্যথিত করেছে। মহানবী (সা.) তখন হযরত আবু হুযায়ফাহ্ (রা.)'র কল্যাণের জন্য দোয়া করেন। **(মুসতাদরেক আলাস্ সহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৯, হাদীস নংঃ ৪৯৯৫, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে মুদ্রিত)**

হযরত আবু হুযায়ফাহ্ (রা.) সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হওয়ার তৌফিক লাভ করেছেন আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে ৫৩ বা ৫৪ বছর বয়সে তিনি শহীদ হন। **(আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬২, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে মুদ্রিত)**

এখন আমি আমাদের জামা'তের এক নিবেদিতপ্রাণ সেবক ও বুযুর্গ অধ্যাপক সঊদ আহমদ খান দেহলভী সাহেবের স্মৃতিচারণ করব যিনি সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। গত ২১ জানুয়ারি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতা হযরত মুহাম্মদ হাসান আসান দেহলভী সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন। অনুরূপভাবে তার দাদা পাটিয়ালার শিক্ষক হযরত মাহমুদ হাসান খান সাহেব (রা.)ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর ৩১৩জন সাহাবীর তালিকায় ৩০১ নম্বরে তার নাম এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, "পাটিয়ালার শিক্ষক মৌলভী মাহমুদ হাসান খান সাহেব।" **(পরিশিষ্ট আঞ্জামে আথম, রূহানী খাযায়েন, ১১তম খণ্ড, পৃঃ ৩২৮)**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার অমূল্য গ্রন্থ "সিরাজে মুনীর"–এ 'অতিথিশালা ও কূপ ইত্যাদির নির্মাণের জন্য প্রাপ্ত চাঁদার তালিকা' শিরোনামের অধীনে তার নাম এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, "পটিয়ালার মৌলভী মাহমুদ হাসান খান সাহেব।" **(সিরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৮৫-৮৬)**

অধ্যাপক সঊদ খান সাহেবের পিতা হযরত মুহাম্মদ হাসান আসান দেহলভী (রা.) সাহেবের বয়স যখন দশ-বারো বছর ছিল তখন তিনি খুতবায়ে ইলহামিয়ার সময় কাদিয়ান গিয়ে এই মহান নিদর্শন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। **(মাসউদ হাসান খান দেহলভী প্রণীত 'নয়ী যিন্দেগী', পৃঃ ১০৭, লাজনা ইমাইল্লাহ্ লাহোর কর্তৃক ২০০৭ সালে প্রকাশিত)**

অধ্যাপক সঊদ খান সাহেব ১৯৪৫ সনের এপ্রিল মাসে ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। তিনি আলীগড় থেকে ফার্সীতে বিএ অনার্স করেছিলেন। তার সাথে তার ভাইদের ওয়াক্‌ফের কথা উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ১৯৫৫ সনে একটি জুমুআর খুতবায় বলেন, "আমি মনে করি মাস্টার মুহাম্মদ হাসান আসান সাহেবও এমন আদর্শ স্থাপন করেছেন যা প্রশংসাযোগ্য। তিনি একজন সাধারণ শিক্ষক এবং দরিদ্র মানুষ ছিলেন। তিনি উপোস থেকে হলেও তার সন্তানদের পড়াশোনা করিয়েছেন এবং তাদেরকে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক করিয়েছেন আর সাত ছেলের মধ্যে চারজনকে জামা'তের হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন তারা চার জনই ধর্মের সেবা করছে। সত্যিকার ওয়াক্‌ফে যিন্দেগীর ন্যায় তারা প্রায় সবাই নিষ্ঠার সাথে জামা'তের সেবা করছেন। তিনি (রা.) বলেন, যদি এই সন্তানরা ওয়াক্‌ফ না হতো তাহলে হয়তো তারা সাতজন মিলে দশ বা বিশ বছর যাবৎ নিজেদের পিতার নাম উজ্জ্বল রাখতো আর বলতো, আমাদের পিতা অনেক ভালো মানুষ ছিলেন, কিন্তু যখন আমার এই খুতবা ছাপা হবে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যখন আমার এই খুতবা ছাপা হবে তখন লক্ষ লক্ষ আহমদী মোহাম্মদ হাসান আসানের নাম নিয়ে তার প্রশংসা করবে আর বলবে, দেখ! তিনি কীরূপ দৃঢ়চেতা আহমদী ছিলেন, দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও নিজের সাত সন্তানকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন এরপর তাদের চারজনকে জামা'তের হাতে তুলে দিয়েছেন অর্থাৎ ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন। আর তার সন্তানরাও এমন পুণ্যবান ছিলেন যে, তারা সানন্দে তাদের পিতার এই কুরবানীকে মেনে নিয়েছেন আর নিজেদের পক্ষ থেকেও পিতার এই

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছে। **(মাসউদ হাসান খান দেহলভী প্রণীত 'নয়ী যিন্দেগী', পৃঃ ২০৮, লাজনা ইমাইল্লাহ্ লাহোর কর্তৃক ২০০৭ সালে প্রকাশিত)**

সউদ খান সাহেব ১৯৪৬ সনের জুন থেকে নিয়ে ১৯৪৯ সনের অক্টোবর পর্যন্ত কাদিয়ানের তা'লীমুল ইসলাম উচ্চবিদ্যালয়ে পাঠদান করেন। ১৯৪৯ সনের অক্টোবর থেকে কয়েক মাসের জন্য জামেয়া আহমদীয়ায় ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে ১৯৫০ সনে পশ্চিম আফ্রিকার ঘানায় ধর্মসেবার মানসে প্রেরণ করেন। **(তারীখে আহমদীয়াত, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ২৮৬)**

তিনি ঘানার আহমদীয়া সেকেন্ডারী স্কুল-এ প্রথম সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। এর জন্য ১৯৫০ সনের ৩০ এপ্রিল তিনি করাচী থেকে যাত্রা করেন এবং ৩০ জুন কুমাসি পৌঁছেন। অর্থাৎ, মে এবং জুন এই দু'মাস সফর করে সেখানে পৌঁছেন। (বর্তমানে আমরা পাঁচ-ছয় ঘন্টায় সেখানে পৌঁছে যাই।) পহেলা জুলাই থেকে তিনি কুমাসির আহমদীয়া সেকেন্ডারী স্কুলে পাঠদান আরম্ভ করেন। **(মাসউদ হাসান খান দেহলভী প্রণীত 'নয়ী যিন্দেগী', পৃঃ ২৭৬-২৭৭, লাজনা ইমাইল্লাহ্ লাহোর কর্তৃক ২০০৭ সালে প্রকাশিত)**

তার এই সফরে কেন এত সময় লেগেছিল, সে সম্পর্কে তার ভাতিজা ইরফান খান লিখেছেন, তিনি তার প্রথম কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে রাবওয়া থেকে ঘানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন আর তিন মাসে অত্যন্ত কষ্টদায়ক (এটি প্রায় দু'মাস হবে) পথ পাড়ি দিয়ে কুমাসি পৌঁছেন। সে যুগে সামুদ্রিক জাহাজ পরিবর্তন করে করে পুরো সফর করতে হতো। উড়োজাহাজে নয় বরং সামুদ্রিক জাহাজে যেতে হতো। অতএব, তিনিও করাচী থেকে 'আদান' এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি ১৬০ রূপীতে খাবার বিহীন টিকিট সংগ্রহ করেন এবং 'আদান' থেকে ঘানার উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক জাহাজের পাশাপাশি বাস, ট্রাক এবং উড়োজাহাজে করে নাইজেরিয়া পর্যন্ত সফর করেন। নাইজেরিয়ান বিমানের ৫৫ পাউন্ডের টিকিট ক্রয় করার জন্য তিনি নিজের ট্রাঙ্ক এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করে দেন আর নিজের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র একটি চাদরে বেঁধে নেন। এরপর নাইজেরিয়া মিশন হাউস থেকে তাকে ঘানা পর্যন্ত বাসের টিকিট দেয়া হয়। নিজের জিনিসপত্র বিক্রি করে নাইজেরিয়া পৌঁছার জন্য কিছুটা পথ উড়োজাহাজে সফর করেন। এরপর নাইজেরিয়া থেকে বাসে করে ঘানা পর্যন্ত সফর করেন। ১৯৫০ সনে পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকা এবং হল্যান্ড-এর জন্য আটজন আহমদী মুবাল্লিগ প্রেরণ সম্পর্কে আহমদীয়াতের ইতিহাসে তার নাম তালিকার শুরুতেই রয়েছে আর সেখানে ১ নম্বরে লেখা আছে, সউদ আহমদ খান সাহেব, (ঘানার উদ্দেশ্যে লাহোর থেকে যাত্রা করেন ২৫ আমান ১৩২৯ হিজরী)। **(তারীখে আহমদীয়াত, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ২৮৬)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র নির্দেশে ১৯৫৮ সনে তিনি পাকিস্তানে (ফিরে) আসেন আর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর করেন। এরই মাঝে তার পিতা মোহতরম হাসান আসান দেহলভী সাহেব ১৯৫৫ সনের আগস্ট মাসে ইন্তেকাল করেন। তার ঘানায় অবস্থানকালেই তার পিতা ইন্তেকাল করেন। ১৯৬১ সনে পুনরায় ঘানায় তার পদায়ন হয়, যেখানে তিনি আবারও পূর্ণ উদ্যমে ১৯৬৮ সন পর্যন্ত ধর্মসেবার সৌভাগ্য পেতে থাকেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর অনুমোদনক্রমে হুযূরের ইউরোপ সফরের সময় রাবওয়ার মসজিদ মুবারক-এ মাগরিবের নামাযের পর 'মজলিসে তালকীনে আমল' গঠিত হয়, যার অধীনে প্রতিদিন ১৫ মিনিটের একটি তরবিয়তী বক্তৃতা হতো। ৭

জুলাই থেকে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তা শোনা হতো আর এক জ্ঞানগর্ভ সভা ছিল। এই মসলিসে জামাতের যেসব বুযুর্গ আলেমের বক্তৃতা হয় তাদের মাঝে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **(তারীখে আহমদীয়াত, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২-৩৯৩)**

সালানা জলসার সময় বক্তৃতাসমূহের অনুবাদের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর বক্তৃতা সমূহের ইংরেজী অনুবাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। রাবওয়ার শেষ জলসা পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

অধ্যাপক সঊদ খান দেহলভী সাহেবের ছাত্রদের মাঝে ঘানার মোকাররম আব্দুল ওহাব আদম সাহেব এবং এখানে বসবাসকারী বি, কে আডু সাহেবও ছিলেন। ১৯৬৮ সনে পাকিস্তানে ফিরে আসার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) মোকাররম অধ্যাপক সঊদ আহমদ খান দেহলভী সাহেবকে তা'লীমুল ইসলাম কলেজে ১৯৬৯ সনে পাঠদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) অধ্যাপক সঊদ খান সাহেবকে জামেয়া আহমদীয়ায় এক বছরের জন্য ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। জামেয়া আহমদীয়ায় নিযুক্ত হওয়ার সময়ও তিনি তা'লীমুল ইসলাম কলেজে অধ্যাপক হিসেবে পাঠদানের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি ১৯৮৭ সনের ২ মার্চ থেকে জামেয়া আহমদীয়ায় দায়িত্ব পালন আরম্ভ করেন আর এক বছর পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

অধ্যাপক সঊদ খান দেহলভী সাহেব সম্পর্কে তার বড় ভাই মাসুদ খান দেহলভী সাহেব বলতেন, (যিনি আল্ ফযলের সম্পাদকও ছিলেন, মাত্র কয়েক বছর পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন) আমাদের ভাই সঊদ আহমদ একটি ভ্রাম্যমান পাঠাগার। বহু বিষয় তার জানা ছিল। জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তার কন্যা রাশেদা সাহেবা লিখেন, আমার পিতা কোমল স্বভাবী, পরম বিনয়ী আর জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন। খুবই ইবাদতগুযার ও তাহাজ্জুদগুযার বুযূর্গ ছিলেন। খুবই অতিথিপরায়ণ এবং ভদ্র মানুষ ছিলেন। আর যা কিছু তিনি লিখেছেন এগুলো সবই বাস্তব, তিনি প্রকৃতপক্ষে এমনই ছিলেন।

তার ভাতিজা নাফিস আহমদ আতিক জামা'তের মুরব্বী। তিনি লিখেন, মরহুম অত্যন্ত বিনয়ী, মুত্তাকী, আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারী একজন পুণ্যবান এবং সাদা-মনের মানুষ ছিলেন। তার নিষ্ঠা এবং ধর্মসেবার প্রেরণা সকল ওয়াকফে যিন্দেগীর জন্য ছিল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এই মুরব্বী সাহেব আরো লিখেন, একবার (তিনি) অধমকে বলেন, পোশাক এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। ফ্যাশন, কৃত্রিমতা এবং বিলাসিতা একজন ওয়াক্‌ফে যিন্দেগীর শোভা পায় না। তার জীবনে লজ্জাশীলতার দিকটিও উল্লেখযোগ্য ছিল।

সঊদ খান সাহেবের ঘানিয়ান ছাত্র আই, কে গিয়াসি সাহেব লিখেন, সঊদ সাহেব ১৯৫০ থেকে ৫৫ পর্যন্ত কুমাসির তা'লীমুল ইসলাম সেকেন্ডারী স্কুলের প্রথম সহকারী প্রধান শিক্ষক বা সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন আর ডাক্তার এস, বি আহমদ সাহেব-এর প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সঊদ সাহেব ইংরেজী সাহিত্য, ইংরেজি ইতিহাস এবং ইউরোপের ইতিহাসের অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং নামকরা আলেম ছিলেন। তিনি তাকে পড়াতেন। তিনি অর্থাৎ এই ঘানিয়ান বন্ধু আরো লিখেন, তার ইংরেজি ব্যাকারণের যতটা সম্পর্ক রয়েছে, বিশেষত বাক্যের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার মতো আমি আর কাউকে দেখি নি। তিনি বলেন, আমার ভাষার মানোন্নয়নে তার অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে।

রাবওয়ার জামেয়া আহমদীয়ার সিনিয়র সেকশনের প্রিন্সিপাল মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব লিখেন, অধ্যাপক সঊদ খান সাহেব অত্যন্ত বিনয়ী, বুযুর্গ এবং জামাতের জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি যখন জামেয়ায় পাঠদান করতেন তখন আমরাও ছাত্র ছিলাম। জামেয়ার শেষ বর্ষ পর্যন্ত সবসময় সময়মতো ক্লাসে আসতেন আর পিরিয়ড শেষ হওয়ার শেষ মিনিট পর্যন্ত পড়াতেন। ছাত্ররা অনেক সময় পড়া থেকে মনোযোগ সরানোর জন্য এদিক সেদিকের কোন কথায় তাকে রত করার চেষ্টা করতো কিন্তু তিনি কঠোরতা ও বকাঝকার পরিবর্তে খুবই সুন্দরভাবে তা এড়িয়ে যেতেন এবং পড়ানো অব্যাহত রাখতেন। তিনি বলেন, আমি একটি কথা নোট করেছি, তার হৃদয়ে ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী ছাত্রদের প্রতি অনেক সম্মান ছিল, আর ক্লাসে কাউকে কোন কারণে যদি কঠোরভাবে সতর্ক করতে হতো সেক্ষেত্রেও তার আত্মসম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তিনি আরো লিখেন, এমটিএ'র প্রারম্ভিক যুগে যখন বিভিন্ন অনুষ্ঠান রেকর্ড করা হয় তখন তিনি অর্থাৎ, সঊদ খান সাহেব সীরাতুন্নবী (সা.) সম্পর্কে অনুষ্ঠান রেকর্ড করান। তিনি বার্ধক্যে ছিলেন, কিন্তু পুরো অনুষ্ঠান অত্যন্ত পরিশ্রম করে নিজে প্রস্তুত করতেন আর আমাদের মাঝে প্রশ্ন বণ্টন করে দিতেন। সবগুলো প্রশ্ন নিজের হাতে লিখে দিতেন। তিনি বলেন, কখনো কখনো পরিবেশ কিছুটা উত্তপ্তও হয়ে যেতো, অনুষ্ঠান করার সময় তর্ক বেঁধে যেত যে, এটিকে এভাবে নয় বরং সেভাবে করতে হবে, কিন্তু তিনি এত নম্র এবং বিনয়ী মানুষ ছিলেন যে, তার কপালে কোন ভাজ দেখা দিত না। এমন মনে হতো যেন কেউ কোন কটুকথা বললে সেটি তার কানে প্রবেশই করে নি, আর অন্য কেউ উত্তর দিলে তিনি মুচকি হেসে একান্ত সহজভাবে যেখানে প্রোগ্রাম বাধাগ্রস্ত হতো সেখান থেকেই পুনরায় রেকর্ডিং আরম্ভ করাতেন।

অধ্যাপক সঊদ খান সাহেবের ইন্তেকালের পর তার বাড়ির পাশে বসবাসকারী প্রতিবেশি ফযল ইলাহী মালেক সাহেব নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে ডুকরে ডুকরে কেঁদে বলেন, এমন প্রতিবেশি সবার ভাগ্যে জুটে না। (তিনি) খুবই সাদা মনের একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন।

তিনি এক পুত্র এবং দু'কন্যা রেখে গেছেন। তার এক পুত্র সা'দ সঊদ সাহেব যুক্তরাজ্যে একটি জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সম্পর্কে যা লিখা হয়েছে, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, বাস্তবেও তার গুণাবলী এগুলোর তুলনায় অনেক বেশি ছিল। খিলাফতের সাথে ঐকান্তিক ভালোবাসা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল আর অসাধারণ মানের ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তান এবং বংশধরদেকেও খিলাফত এবং জামা'তের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত রাখুন এবং তার পদমর্যাদা ক্রমাগত উন্নীত করুন। নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব। (ইনশাআল্লাহ্)

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৭ মার্চ ২০১৯, পৃঃ ৫-৯)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)